এক ব্যতিক্রমী প্রধান শিক্ষক

পঞ্চশীলা মজুমদার

১৯৮৫ সালে তেহট্ট হাই স্কুলে যখন প্রথম শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে কাজে যোগ দিই, তখন কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে রেল যোগাযোগহীন নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী এই ব্লকটিতে (তখনও মহকুমা হয় নি) চাকরি হলেও মনে মনে প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব ছিল এই ভেবে যে ঐ স্কুলের হেডমাস্টার মশাই দিলীপ বাগচী। যে দিলীপ বাগচীর গান প্রথম শুনেছি কৈশোরে, ''নভেম্বরের ডাক শোনো''। তারপর শুনেছি দিলীপ বাগচীর একক সংলাপে, মুর্শিদাবাদের ডায়েলেক্টে এক গ্রামীণ কৃষকের কলকাতায় যুক্তফ্রন্টের মিছিলে যাবার অভিজ্ঞতা। কৃষকটি জানে, মিছিলে গেলে বলতে হয় ''মানতি হবে, দিতি হবে''। কিন্তু কি 'মানতি হবে দিতি হবে' সে জানেনা। ফরোয়ার্ড ব্লক তার উচ্চারণে 'ফ্যালার বাপ'। প্রতিটি সংলাপে কৌতুক আর ব্যঙ্গে ভরা এই অনবদ্য ক্যাসেটটি শোনার পর, তাঁকে চাক্ষুষ করলাম তেহট্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে।

আমি স্কুলে যোগ দেবার প্রথম দিনই তিনি জানিয়ে দিলেন, সময়মত এবং নিয়মিত স্কুলে যাওয়া আসার প্রয়োজনে তেহট্টে বাসা করে থাকাই শ্রেয়। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি বাসাও ঠিক করে দিলেন। স্কুলে প্রথম দিন গিয়ে যে বিষয়টি এতদিনের অভ্যস্ত চোখকে ধাক্কা দিল, তা হ'ল ছাত্রদের ইউনিফর্ম। নীচু ক্লাসের ছাত্রদের পোষাক সাদা সার্ট আর নীল হাফপ্যান্ট হলেও, উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা সবাই পরেছে সাদা পাজামা আর আকাশী রঙের পাঞ্জাবী। ঐ স্কুলে দিলীপবাবুই প্রথম ইউনিফর্ম চালু করেন। পাজামা পাঞ্জাবী পরতে অনিচ্ছুক ছাত্রদের জন্য বিকল্প পোষাক ছিল ধুতি পাঞ্জাবী অথবা নেভি ব্লু স্যুট। তেহট্টের মত গ্রামীণ এলাকার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা তাদের ছেলেদের জন্য ধুতি পাঞ্জাবীই বেছে নিয়েছিলেন। এই পোষাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে হেড মাস্টার মশাইয়ের যুক্তি ছিল, এলাকার অধিকাংশ অভিভাবকেরই দুটি বা তিনটি সন্তান যেখানে স্কুলে পড়ে, তাদের পক্ষে পড়াশোনার খরচ চালিয়ে সার্ট প্যান্ট তৈরী করা খরচ সাপেক্ষ। মাস দুয়েক পরে এগারো ক্লাসের ছাত্রদের ভর্তির সময় এলো। ফর্ম নেবার কাউন্টারের সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হল একটি নোটিস - ''দীর্ঘ কেশযুক্ত অর্ধনারীশ্বর চেহারার কেহ একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হইতে পারিবে না''। দিলীপবাবুর লেখা ঐ নোটিসের সঙ্গে তাঁরই আঁকা একটি লম্বা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কেশযুক্ত মুখের ছবি শোভা পাচ্ছিল, বিষয়টি প্রাঞ্জল করার জন্য। আশির দশকে তখনকার সুপার স্টার অমিতাভ বচ্চনের অনুকরণে হেয়ার স্টাইলের একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ছাত্রদের মধ্যে। তাকে ঠেকাবার জন্য হেড মাস্টার মশাইয়ের এই সতর্কতামূলক নোটিস। প্রতিটি ছাত্রই কিন্তু সম্ভ্রমের সাথে এই নোটিসকে মেনে চলত। এই নোটিসের প্রভাবে শিক্ষকরাও কেউ কেউ তাঁদের লম্বা চুল কেটে ফেলেছিলেন।

দিলীপবাবু যখন প্রধান শিক্ষক, তখন আজকের মতো 'শিক্ষার অধিকার আইন'-এর বলে শিক্ষকদের বেত্রাঘাতের অধিকার, দৈহিক শাস্তি, মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধ হয় নি। হেড মাস্টার মশাই রীতিমতো বেত হাতেই ছেলেদের শাসন করতেন। যে ছেলেটি 'উত্তম'-এর বিপরীতার্থক শব্দ লেখে 'সুচিত্রা', তাকে 'পন্টক' বলতেও দ্বিধা করতেন না। দিলীপবাবুর ব্যাখ্যায় 'কন্টক' যদি হয় কাঁটা, 'পন্টক' হবে তাহলে পাঁটা। মাধ্যমিকে দু'বার অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রের সম্পর্কে তার সামনেও যদি বলতেন, ''ও মাধ্যমিক দিয়া থাকে'', ছেলেরা কিন্তু সেটাকে মানসিক নির্যাতন বলে মনে করতো না।

স্কুলে যোগ দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই দিলীপবাবু ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন বেশ কিছু কাজের জন্য। ছাত্রদের জন্য একাদশ শ্রেণীর নবীনবরণ তো ছিলই, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যেও নবীনবরণ শুরু করলেন। তাঁর মতে, এগারো ক্লাসের ছাত্ররা অধিকাংশই আসছে একই স্কুল থেকে, কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর সব ছাত্রই স্কুলে নতুন। নবীনবরণে তিনি নিজে গেয়েছিলেন নিজের লেখা নিজের সুর দেওয়া 'সুবর্ণরেখার সোনা সোনা জলে ...'। হেডস্যারের গলায় ছাত্রেরা প্রথম শুনলো 'উই শ্যাল ওভারকাম'। পুরনো ছাত্রদের স্মৃতিতে আজো গানগুলি অম্লান। আমি দেখেছিলাম, 'আয় আয় আয় নতুন দিনের গান গাই' - গানটি শুনে ছাত্রদের মধ্যে কি উন্মাদনা! রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিন দিন ধরে স্কুলে হত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক প্রতিযোগিতা। স্থানীয় একটি খেলার ক্লাবেও মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক শাখা।

ভালো শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। ইংরেজী, বাংলা দুটি বিষয়েই সমান দক্ষতার সাথে পড়াতেন। তখনকার দিনে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তবুও দিলীপবাবু টিউশনি করতেন না। মাঝে মাঝে ছাত্রদের বাড়তি ক্লাস নিতেন। কোন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লে তার ক্লাস নিয়ে ক্লাসের ঘাটতি মেটাতেন। কোন সমস্যায় পড়ে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কেউ খাতা দেখতে না পারলে, নিজেই সেই দায়িত্ব নিতেন ছাত্রদের স্বার্থে ।

দিলীপবাবু প্রধান শিক্ষক হয়ে কাজে যোগ দেবার আগে স্কুলে যে পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল, যে ব্যবস্থাগুলি প্রচলিত ছিল, তিনি এসে সেগুলির গুণগত পরিবর্তন ঘটালেন - কিছু পরিবর্তন, কিছু সংস্কারের মধ্য দিয়ে । দিলীপদার ভাষায় এ ছিল তাঁর 'হেড়ুগিরি' । অধিকাংশ শিক্ষক এই নতুন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন । কারণ সেখানে আপত্তি করার কোনো সুযোগ ছিল না । পরিবর্তনগুলি ছিল স্কুলেরই স্বার্থে । সেই সাথে তার পেছনে ছিল আইনের অনুমোদন এবং অভিভাবক ও ছাত্রদের সমর্থন । এইভাবে চললে হয়তো তিনি অবসরের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্তই তেহট্ট হাই স্কুলে থাকতে পারতেন ।

কিন্তু এই 'হেড়ুগিরি'র মাঝেই কিছু প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনীতির অনুপ্রবেশ, কিছু কিছু বিষয়ে হেড মাস্টার মশাইয়ের সিদ্ধান্তের ফলে পরিস্থিতি হয়ে উঠলো উত্তপ্ত । তাতে ঘৃতাহুতি দিল সংকীর্ণ দলীয় ও গ্রাম্য রাজনীতি । এগুলি মোকাবিলার ক্ষেত্রে দিলীপবাবু তাঁর 'নিজস্ব পদ্ধতিতে' কাজ করতেন এবং তার মধ্যেও যথারীতি খুঁজে পাওয়া যেত তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসিক সত্ত্বাকে । এইরকম একটি পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সামলাতে পারছিনা ।

আশির দশকে শিক্ষকরা মাস পয়লা বেতন পাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না । তাঁরা নিয়মিত বেতন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন । তেহট্টের মত সীমান্তবর্তী গ্রামে বেতন হত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ থেকে তৃতীয় সপ্তাহের প্রথমদিকে । এমনকি চতুর্থ সপ্তাহে বেতন পাবার অভ্যাসও তাঁদের ছিল । এই সময়ে একবার কোনো প্রশাসনিক কারণে (ম্যানেজিং কমিটি না থাকায়) বেতন হতে ঐ স্কুলে বাড়তি কয়েকদিন দেরি হয়েছিল । এই সময় বামপন্থী শিক্ষকদের নেতৃত্বে শিক্ষকরা একদিনের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেন । কয়েকঘন্টার মধ্যে মৌখিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষকরা পরদিন স্কুলের হাজিরা খাতায় সই করে স্টাফরুমে বসে কর্মবিরতি পালন করছিলেন । ছাত্ররা শিক্ষকদের ক্লাসে আহ্বান করে প্রত্যাখ্যাত হল । এমন সময় দেখা গেল ছাত্রদের হাতে হাতে ঘুরছে একটি লিফলেট । তেহট্ট ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রকাশিত ঐ লিফলেটে 'শিক্ষকদের নিয়মিত ও যথাসময়ে বেতন দিতে বামফ্রন্ট সরকারের অক্ষমতার কারণে তেহট্ট স্কুলের শিক্ষকদের কর্মবিরতিকে পূর্ণ সমর্থন' জানানো হয়েছে । এই ঘটনার আকস্মিকতায় বাম পন্থী শিক্ষকেরা আক্ষরিক অর্থেই বাক্যহারা ! এই সময় নিরীহ মুখে স্টাফরুমে এসে বসলেন হেডমাস্টার মশাই ! দাবার মোক্ষম চাল দেবার ফলাফল পর্যবেক্ষণের মজা উপভোগ করতে !

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

দিলীপবাবু তেহট্ট হাই স্কুল থেকে সাসপেন্ড হন ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি। কয়েকমাস পর সম্পূর্ণ বরখাস্ত হন। সেই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে তিনি আবার সাময়িক বরখাস্তের অবস্থায় ফিরে আসেন। স্কুলে, স্কুলের বাইরে এবং কৃষ্ণনগরে তাঁর শুভার্থীরা সবাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে মামলা করতে, কারণ, তাঁর কেসের যা মেরিট, তাতে তিনি মামলা করলেই জিতে যেতেন। অন্য কেউ হলে এক্ষেত্রে সর্বস্ব পণ করে মামলা লড়তেন। দিলীপবাবু কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ বেতন পেয়েই বলতেন - 'তোমরা চাকরি করে ষোল আনা পাচ্ছ, আমি না ক'রে বার আনা'। তাঁর পরিকল্পনা ছিল অবসরের কয়েকমাস আগে মামলা লড়ে স্কুলে যোগ দেবেন, যাতে বেশি দিন স্কুলে না যেতে হয়। তাই সাসপেন্ড হয়ে কৃষ্ণনগরে বসে তিনি একে একে লিখে গেছেন 'ভোটের ছড়রা', কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে 'গাজীর গান', অনীক সহ বিভিন্ন পত্রিকায় সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধসহ ছড়া ও ব্যঙ্গরচনা। যুক্ত হয়েছেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে। নিয়মিত আড্ডা দিয়েছেন বিভিন্ন 'ঠেকে'।

সাসপেন্ড থাকাকালীন অবস্থায় 'সম্মানজনক শর্তে' তাঁর চাকরী ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব এসেছিল, যা তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। 'সম্মানজনক আপোষ' ছিল তাঁর কাছে সোনার পাথরবাটির মত। এর কিছুদিন পরেই তাঁর অবসরের সময় চলে আসে। মামলা না লড়ার জন্য পেনশন সহ অবসরকালীন সমস্ত সুবিধা থেকে আমৃত্যু বঞ্চিত ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারও একইভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। তাঁর সাসপেনশনে কার কতটা লাভ হয়েছে জানি না - তেহট্ট হাই স্কুল কিন্তু অসময়ে হারিয়েছে একজন যোগ্য, গুণী প্রধান শিক্ষককে। 'উপযুক্ত' কথাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম না। দলতন্ত্রের দাসত্ব করে প্রধান শিক্ষকের পদটি বজায় রাখার উপযুক্ত তিনি ছিলেন না, আবার দু'নৌকোয় পা রেখে ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশলটিও ঐ মানুষটির জানা ছিল না। স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় একবার কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, ''তুমিও একটা ঝামেলা পাকিয়ে সাসপেন্ড হয়ে যাও। ডেইলি প্যাসেঞ্জারিও করতে হবে না, কৃষ্ণনগরেও থাকতে পারবে''। দিলীপদার পরামর্শে সাড়া না দিয়ে আমি অনেকের মতই ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানারকম কম্প্রোমাইজ করে আজও চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছি, কেননা দিলীপ বাগচী একজনই হয়।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।